আবদুল আজীজ আল-আমানের গল্প : গ্রামজীবনের হৃদস্পন্দনের মুখর শব্দে স্বতন্ত্র স্বর

আহমেদ সাকির

এক

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত রাজপথ ধরে, দলপতি মীর মশারফ হোসেনের সহযাত্রী হয়ে, বেশ কিছু মুসলিম লেখক সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। 'বিষাদসিন্ধু'র (১৮৮৫) কাল থেকে শুরু করে মোহাম্মাদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, শেখ হবিবর রহমান, মহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী, শেখ ফজলুল করীম, শাহাদাৎ হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, মোজাম্মেল হক, এম. নাসিরুদ্দীন, আবদুল মজিদ খোন্দকার, মোহাম্মদ আবদুর রসিদ সিদ্দিকী, কাজী ইমদাদুল হক, গোলাম মোস্তাফা, বন্দে আলী মিয়া, সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী, এস ওয়াজেদ আলী, ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম কুদ্দুস, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ লেখক-শিল্পী উৎস-মুক্ত নদীর মতো একই ধারায় অবাধে চলে আসছিলেন। এই সময় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দেখা দিয়েছিল কয়েকটি বিপর্যয়—প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমর, দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, প্রথম বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১), ভারত-পাকিস্তানের সূচিমুখ প্রশ্ন-সংকট এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ (১৯৪৭)। এমনতর বিপর্যয়ে, স্বাভাবিকভাবেই, দেশীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিন্যাস-ব্যবস্থা পাল্টে যেতে থাকে। আর তারই নির্মম ফলস্বরূপ কিছু মুসলিম লেখক এপার বাংলা ছেড়ে ওপার বাংলায় চলে যান। আবার নীতিগত কারণে রেজাউল করীম, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো হাতে-গোনা কয়েকজন লেখক এপার বাংলায় থেকে যান। এইরকম ক্রান্তিকালীন সময়ে স্বভাবতই মুসলিম কথাসাহিত্যিক সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের ধারাটির গতি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। আসলে মুসলিম জীবন তখন এক অজানা আশঙ্কায়, অভিভাবকহীনতার হীনম্মন্যতা বুকে নিয়ে অস্তিত্বের প্রশ্নে ছিল দিশেহারা। ফলে দেড় দশকের বন্ধ্যাত্ব, জড়তা ও অস্থিরতা কাটিয়ে পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মরু-জমিনে দু-একটি সবুজ চারার অঙ্কুরোদগম দেখা দিল। ষাটের দশকে এসে তারা বেশ পুষ্পিত ও ফলপ্রসু হয়ে উঠল। যদিও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য তখন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মাতোয়ারা। তার সেই প্রবল কলরোল ও উচ্ছ্বাসের আবহে যে দু-একটি কুড়ি বিকশিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-১৯৯৪) একটি বর্ণবন্ত কুসুম—একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ—দীর্ঘ এই চুয়াল্লিশ বছরে আল-আমান লিখেছেন

সাতচল্লিশটি গল্প। এই সময়সীমার মধ্যে লক্ষণীয়, আল-আমানের গল্প রচনায় এক সময়ে জোয়ার নেমেছে, তো পরবর্তীতে ভাটার টানে কোন রহস্যালোকে সেই সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে 'সালমা শাহেদ শিরিন' গল্পগ্রন্থের প্রবেশক-অংশে লেখক যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উদ্ধারণযোগ্য :

"জীবনের একটি পর্বে ভাব এবং আবেগে এমনভাবে তাড়িত হয়েছিলাম যে, মনে হত আমি দিনে অন্তত একটি করে গল্প উপহার দিতে পারি। দিয়েও ছিলাম। কয়েকটি বইও বেরিয়ে গেল পরপর। তারপর কেমন করে সব যেন থিতিয়ে গেল। ভাবলাম ব্যস্ততার কী আছে, সময় ত আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া তাড়াহুড়োর মধ্যে সৃষ্টিতে যাকে বলে 'পাক ধরা' তার অনটন থাকবেই। তাই থেমে পাক ধরার অবকাশ দিতে গিয়ে দেখি জৈষ্ঠের ডালে আর পাকা আম বড়ো একটা নেই, কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া থামার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সম্ভাবনাও ঝরে গেছে। আমার লোভ আর মানুষেরা আমার নিরিবিলি কেড়ে নিয়েছে।"

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কিংবা আব্দুল জব্বারের মতো পাঁচের দশকের শুরুতে তাঁর আবির্ভাব হলেও বস্তুত ছয়ের দশকেই তিনি সৃষ্টিশীল ছিলেন। তাঁর সাতচল্লিশটি গল্পের মধ্যে চল্লিশটিই তিনি লিখেছেন ১৯৬৭ সালের আগে। এই গল্পগুলি মূলত 'জাগরণ' সৃষ্টিশীল ছিলেন। তাঁর সাতচল্লিশটি গল্পের মধ্যে চল্লিশটিই তিনি লিখেছেন ১৯৬৭ সালের আগে। এই গল্পগুলি মূলত 'জাগরণ' ও 'কাফেলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সাতের দশকে লিখেছেন দুটি ('বনমানুষের হাড়' ও 'উন্মোচন'), আটের দশকে একটি ('নাবুবাবু') ও নয়ের দশকে চারটি ('হাসনুহানার সৌরভ', 'ছোটহাজির শিল্পপ্রদর্শনী', 'পলাতক এক মুজাহিদের কথা' ও 'শামসুর ভুবন') গল্প। হাতে-গোনা এই গল্পগুলি নবপর্যায় 'কাফেলা' ও 'নতুন গতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

চার দশকের বেশি সময়ের মধ্যে আল-আমানের সাতটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল—'সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন' (১৩৬৯), 'শেখজী ও দ্বিতীয় পক্ষ' (১৩৭৬), 'সালমা শাহেদ শিরিন' (১৩৯১), 'রৌদ্রময় ভূ-খণ্ড' (১৩৯৩), 'বাদামতলির মৃত্যু' (১৪০১), 'আল-আমানের প্রেমের গল্প' (১৪০১) এবং 'আল-আমানের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৪০১)। এই সংকলনগুলিতে প্রকাশিত মোট গল্পের সংখ্যা ছেষট্টিটি। তার মধ্যে 'রৌদ্রময় ভূ-খণ্ডে' স্থান পেয়েছে উনিশটি গল্প। এই গল্পগুলি মৌলিক নয়—প্রত্যেকটিরই উৎসমূল আল-হাদীস। তবে বিশুদ্ধ হাদীস থেকে বেরিয়ে এসে এগুলি রস-সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ধারার নির্মাণ করে দিয়েছে। গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে। এখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের আশ্চর্য ঘটনামালা এক অনন্য ভাষায় তুলে ধরেছেন গদ্যশিল্পী। এই গ্রন্থটির বিশেষত্ব এসেছে শিল্প-প্রকরণে, প্রকাশ-বিন্যাসে ও ভাষা-নির্মাণ দক্ষতায়। এই সংকলনের উনিশটি গল্প বাদ দিলে বাকি সাতচল্লিশটি গল্প নিয়েই আল-আমানের গল্প-বিশ্ব।

দুই

আল-আমান মূলত গ্রাম্য জীবনের কথাকার। ফলে তাঁর গল্পগুলি গ্রামজীবনের চালচিত্রের হৃদস্পন্দনের শব্দে মুখর। সেখানে বেশিরভাগ গল্পেই নিতান্ত অভাব জর্জর খেটে-খাওয়া মানুষ, চাষি, জেলে, হাটুরে, ঝি, গাড়োয়ানদের জীবনকথা গল্প-বিষয় হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন গল্পে সমাজের নানান স্তরের মানুষের সততা-মহানুভবতা-মানবিকতা, অত্যাচারিত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত অবস্থা, প্রেম-সফলতা কিংবা প্রেম-ব্যর্থতা, স্নেহ-বাৎসল্য হৃদয়ার্তি, আত্মমর্যাদা, সুবিধাবাদিতা কিংবা রহস্যময়তা মূর্ত হয়েছে।

তাঁর 'চন্দনকাঠের ধোঁয়া' গল্পে এক গ্রাম্য স্কুলের বৃদ্ধ শিক্ষক নিত্যানন্দ ঘটক ওরফে নিতাইবাবুর মানবিক সহানুভূতি উদারতা ও সহযোগিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। গল্প-কথক যেদিন স্কুলটিতে শিক্ষক হিসেবে প্রথম যোগদান করেন সেদিন সর্বপ্রথম নিতাইবাবুই তাঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করেন। চেহারায়, বেশভূষা ও আচরণে তিনি চরম দারিদ্র্য ও হীনতার পরিচয় দিলেও কোনোদিনই তাঁর অর্থসঙ্কট ছিল না। আসলে তিনি একজন টিপিক্যাল সুদের কারবারি। তাই যেকোনো মুহূর্তে প্রার্থীকে সুদের টাকা ধার দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর মলিন জামার পকেটে একশো টাকার নোট রেখে দেন। অথচ এহেন নিতাইবাবুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আর-এক অন্যতর মানুষ। গ্রামে বসন্ত রোগের মড়কে একদা নিতাইবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা মেরে-পালানো হামিদ সাহেবের বড়ো ছেলেটি মারা যায়। হামিদ সাহেবের কপর্দকহীন স্ত্রী অর্থাভাবে ছেলের সৎকার করতে না-পারার বেদনায় কাঁদতে থাকে। এমতাবস্থায় গল্প-কথক হামিদ সাহেবের বাড়ি এলে নিতাইবাবুর এক অন্য চিত্র দেখতে পান:

"কাফন কেনার টাকা নেই। নিতাইবাবু দশ টাকা বার করে দিলে ময়লা জামার পকেট থেকে বলল : ভেবো না মা! কাফনটা এলেই কবর দেবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আমরা সবাই আছি।"

এইভাবে এক অসহায় আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া শুধু নয়, তার বুকফাটা কান্নার সান্ত্বনা দিতে দিতে নিতাইবাবুর নিজেও কেঁদে ফেলা মানবিক মহানুভবতার অসাধারণ নিদর্শন।

দারিদ্রপীড়িত মানুষ সমাজের উচ্চতর শ্রেণির হাতে শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে কীভাবে বিপর্যস্ত হয় আল-আমানের 'দশ টাকার হালিমা' গল্পে হালিমার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত অসহায় জীবনের সূত্রে তা ধরা পড়েছে। একমাত্র পুত্র আবুকে সম্বল করে বেঁচে-থাকা অসহায় হালিমা মাসিক দশ টাকার পারিশ্রমিকে চৌধুরীবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। সারাদিন সকলের ফরমাশ নীরবে পালন করলেও সঙ্গে আসা আবুর দুরন্তপনার কারণে তাকে মাঝেমধ্যে চরম লাঞ্ছিত হতে হয়। মেজ বউ ছাড়া চৌধুরীবাড়ির অন্য সব সদস্যরা হালিমাকে ও আবুকে বকাঝকা আর মারধর করে। কখনো চৌধুরীবাড়ি থেকে তাড়া খাওয়ার পর মাঠে মাঠে ঘুরে

কেবলমাত্র পান্তা খাওয়ার বিনিময়ে দিদার বক্সের তেওড়ে ভেঙে দিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে আখ চুরি করে এনে মাকে দিয়ে বলেছে:

"তুই আর ও শালাদের কাজ করতে যাস নে। ও শালারা একেবারে হারামি। তুই ধান ভানিস মুই মাঠে কাজ করতে যাব কাল থেকে।"

কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত হালিমার কাছে পুত্রের এমন আশ্বাসবাণী শুধু আশ্বাসের স্তরেই থেকে যায়। পরদিন যথারীতি হালিমাকে আবার কাজে যেতে হয় এবং পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার কারণে আবারও তিরস্কার শুনতে হয়। একদিন চৌধুরীবাড়িতে অতিথি আগমনের কারণে রান্না হওয়া পোলাও-মাংস-কোর্মার বেহেস্তি খাদ্য নিয়ে হালিমা বাড়ি এসেছে। তবে ডিমটা সে ভাতের মধ্যে লুকিয়ে চুরি করে এনেছে। আর তার জন্য তাকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছে। মেজ বউকে সামনে রেখে চৌধুরীবাড়ির বড়ো বউ হালিমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি চালিয়েছে:

"আলোটা নীচেয় রেখে নিজেই টান মেরে কাপড়টা খুলে দেয় বড়ো বউ। বুক থেকে কাপড় সরে যায়। একেবারে উলঙ্গ। পা এবং উরু দু'টো জড়ো করে লজ্জাস্থান গোপন করে হালিমা। বুক ফেটে কান্না বেরুতে চায়।"

এই কান্নাই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষগুলোর জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। তাই তো সেদিন ধরা না পড়লেও অপমানিত হালিমা বাড়ি ফিরে ভাত খাবার সময় আবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বুঝেছিল এই বিশাল বিশ্বে এতটুকু শিশু হাবু ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোনো নিরাপদ স্থান নেই।

'সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন' গল্পটি এক গ্রাম্য বিধবা যুবতী আয়েশা খাতুনের কামনা-বাসনাসর্বস্ব জীবনতৃষ্ণার অসংকোচ অথচ শালীনতাযুক্ত মধুর প্রেমাবেগের গল্প। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে সর্পাঘাতে স্বামীর মৃত্যুর পর আয়েশা সোলেমানপুরে নিজের ঘরে একাকী জীবন কাটায়। দিনের বেলায় নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজের হতভাগ্য জীবনের শূন্যতাবোধ তাকে তেমনভাবে পীড়িত না করলেও রাত্রির নীরবতা ও একাকিত্বে সে যৌবনধর্মের আবেগে নিজেই উত্তাল হয়ে ওঠে। সেই উত্তালতার মাঝখানেই একদিকে যেমন নিজের ভালোবাসার স্বামীকে তুলে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিধাতাকে গালাগালি দেয়, তেমনি গ্রামেরই ক'জন যুবক—দিদার, শিউলি, করিম কিংবা আহসানের কাল্পনিক সঙ্গ-কামনা করে সে অধীর হয়ে ওঠে :

"...দুটি সুগোল স্তনভার যেন দুই বিকশিত পুষ্পের স্তবকের মতো বাসনার রং-এ রঙিন হয়ে অনন্ত কামনার সৌরভে ভরপুর হয়ে ওঠে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন জোয়ার জাগে, মাতাল হয়ে ওঠে দেহমন।"

এসবের ফাঁকে ফাঁকে পূর্বরাগময়ী নায়িকার মতো সীমিত সাধ্যের প্রসাধনে নিজেকে সজ্জিত করে সে। গ্রাম্য যুবতীর দেহাকাঙ্ক্ষাযুক্ত এই বাসনা যদিও শেষ পর্যন্ত অবারিত

যৌনতার দিকে যায়নি। তাই কৃষিকাজে মগ্ন দিদার কোদালের কোপে জখম রক্তাক্ত পা নিয়ে আয়েশার কাছে এসে দাঁড়ালে যৌবনধর্মে পুষ্ট তৃষ্ণার্ত কামনাকে আয়েশা সংযম শাসনে বাঁধতে পেরেছে:

"পা জড়িয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে গভীর বেদনায় ডুকরে কেঁদে উঠল আয়েশা। এতদিনের জমাটবাঁধা উত্তাল বেদনারাশি যেন এই সর্বপ্রথম বেরুবার একটা পথ পেল।"

এই কান্নায় আয়েশার কামনা পাপাচারের পথে পরিব্যাপ্ত না হয়ে হৃদয়াশ্রুতে বিধৌত হয়ে তার প্রেম-বাসনাকে মধুর প্রাপ্তির জগতে পৌঁছে দিয়েছে।

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষদের মধ্যেও যে আর-পাঁচজনের মতোই অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্য লুকিয়ে থাকে তা 'মাঠ মাটি হাতেমালী' গল্পে গ্রাম্য জাতচাষি হাতেমালীর স্নেহ-বাৎসল্যের সূত্রে লক্ষ করা যায়। ভয়ঙ্কর খরার সময়ে সংস্কারবশত সারা গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলে পানপীরের থানে 'কাদামাটি' করলে পুত্র সেলিম তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায় হাতেমালী তাকে সপাটে চড় মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। মাঠে হাতেমকে ভাত দিয়ে না-আসার অপরাধে সে সেলিমের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে। পরে স্কুলশিক্ষক রামদয়ালবাবুর অনুরোধে যখন সেলিমের পুনরায় পড়াশোনা শুরু হয় এবং স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বড়ো ডাক্তার হয়ে ফিরে আসে তখন হাতেমালীর খুশির সীমা থাকে না। এরই মাঝে সেলিম কোনও এক শেষ-হওয়া মরশুমের পর জোর করে হাতেমালীকে শহরে নিজের কাছে এনে রাখে। কিন্তু শহুরে আরামের জীবন তার কাছে অসহ্য লাগে। এই গারদবন্দি জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে সেলিমকে কাতর অনুরোধ করে :

"বাবা—আমাকে এখুনিই বাড়িতে রেখে এস। এখানে আর থাকতে পারছি না। রাতে ভারী জ্বর এয়েছে।"

কিন্তু সেলিমের কড়া শাসনে তাকে আরো দুদিন থাকতে হয়। এক্ষেত্রে পিতার স্বাস্থ্যের প্রতি সন্তানের দায়বোধ সেলিমের মধ্যে এসে পড়ে। তাই সে অনুযোগের সুরেই বলে:

"এই ঠাণ্ডায় তুমি এখনও বাইরে বসে আছ। না—শরীরটাকে ভালো হতে দেবে না দেখছি। বৃষ্টির ছাঁটে একেবারে ভিজে গেছ। ওঠ—চল, ঘরে চল।"

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, পুত্র সেলিমের প্রতি যেমন পিতা হাতেমালীর আন্তরিকতা ও স্নেহ-বাৎসল্য সমানে বহমান থেকেছে, তেমনি পিতা হাতেমালীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সেবাযত্নের সূত্রে পুত্র সেলিমের প্রতি-বাৎসল্যের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'শাহানী বেগম ও একটি সরীসৃপ' গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রূরতা, ইতরতা ও কদর্যতার নগ্নরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। রাকিব ও আলেয়াকে বাইরে সুখী দম্পতি বলেই মনে হয়। বাইরে এ কারণেই যে, রাকিবের সাথে কমলাদি ওরফে শাহানী বেগমের একটি অবৈধ সম্পর্ক আছে, যেটি আলেয়া জানত না। এই কমলাদিই চিঠি লিখে নিজে যেচে রাকিবের বাড়ি এসেছেন। তার মাথায় সিঁদুর। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন বেশবাস। তার গাম্ভীর্য, মিষ্টি হাসি,

রুচিবোধ, অমায়িক ব্যবহার মুহূর্তেই আলেয়ার মন জয় করে নিল। দেয়ালে অয়েল পেন্টিংয়ে রাকিবের ঠাকুরদার ছবি টাঙানো ছিল। তিনি সত্যিকারের জমিদার না হলেও নাচ-গানের আসর বসানো কিংবা সুরাপানের মতো জমিদারি আভিজাত্যের সমস্ত কিছুতেই পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় দিতেন। এই সমস্ত কথার মাঝেই কমলাদি আলেয়াকে খাবার খেতে দেবার জন্য তাড়া লাগালে আলেয়া দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। আর তারপরই পাশের ঘর থেকে সেলিম তার দাদা রাকিব ও কমলাদিকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফ্যালে। তারপর কান পেতে শোনে ভয়ংকর কুটিল নারকীয় সংলাপ:

"কমলাদি বললেন : ঐ বুঝি তোমার 'আলোয়া! এতেই মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম ফেল করো। রাকিব বলল : ও সব কথা থাক শাহানী। কিন্তু তুমি আমাকে পর্যন্ত চমকে দিয়েছ মাথায় সিঁদুর, একেবারে বিবাহিতা হিন্দু কুলবধূটি—"।

এরপর খেতে বসে রঙ্গ-তামাশায়, মিষ্টি হাসিতে কমলাদি আবারও সকলের মন জয় করল। পারল না কেবল সেলিমের। সে এতক্ষণে শয়তানের প্রতিমূর্তিকে দেখে ফেলেছে। তাই স্টেশনে এগিয়ে দিতে এসে চলন্ত ট্রেনে কমলাদি ওরফে শাহানী বেগমকে তার মনে হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর একটি সম্পূর্ণ 'ফসল'। যুগ পাল্টালেও মানুষ আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে যে কত নীচে নামতে পারে, সরীসৃপের মতো হীন কুটিল হতে পারে রাকিব ও কমলাদি ওরফে শাহানীর কদর্যতা ও কুটিলতা তারই পরিচয় বহন করে।

আল-আমানের গল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর। সেখানে বিষয় হিসাবে গল্পে যেমন মানুষ ও মানব সমাজ, তার ক্রিয়াকলাপ, জীবনযাপন পদ্ধতি স্থান পেয়েছে, তেমনি মনুষ্যেতর প্রাণীর তথা পশুর সাথে মানুষের মায়াময় সম্পর্কের দিকটিও বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর মানবায়ন ঘটিয়ে তার সঙ্গে মানব-সম্পর্কের অপত্য স্নেহের রসপ্রবাহধারা এই পর্যায়ের গল্পগুলির বিশেষত্বকে চিহ্নিত করেছে। 'নাদুবাবু' এই শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য গল্প।

এই গল্পে পোষা বিড়াল নাদুর প্রতি গল্প-কথকের পরিবারের অপরিসীম আনন্দ-উল্লাস, ক্ষণিক কারুণ্যের উদ্ভাস ও অন্তিমে মধুর রসে শতধা প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে। সদ্য চোখ-ফোটা নাদুকে মনির রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। তারপর নাদুর জন্যে সে জুতোর বাক্স দিয়ে ঘর তৈরি করা, গরম দূর করার জন্য জানালা কাটা ও শোবার জায়গায় কয়েক ভাঁজের পুরু কাপড়ের ব্যবস্থা করেছিল। ক্রমশ মনির ও নাদুর মধ্যে সখ্যতা জমে ওঠে। এই সখ্যতা পরবর্তীতে মনিরের দাদা মিরাজ, মনিরের মা-বাবার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। পোষা প্রাণীটির, মানবেতর প্রাণীটির উপর মনবায়ন ঘটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে :

১। "নাদু এখন আমাদেরই একজন। মনির ত বাইরে থেকে ঘুরে এসে ওকে আগে কোলে নেবে। তারপর আদর করবে, চুমু খাবে।"

২। "...নাদুকে বুকের ওপর তুলে নিল মনিরের মা। কী আদর! কী আদর! ঠিক ছ মাসের ছেলেকে মানুষ যেভাবে আদর করে।"

কিন্তু দিন দিন নাদুর দৌরাত্ম্যের, বিশেষ করে নাদুকে কোলে নিলে জামা-কাপড় ও হাতে লোম জড়িয়ে থাকা, চেয়ারে লোম, সোফার ওপর লোম, নামাজের জায়গার ওপর বসা, মূত্রত্যাগজনিত কটু দুর্গন্ধ ইত্যাদি কারণে মনিরের পিতা তিতিবিরক্ত হতে লাগলেন। তারপর একদিন নৈশ আহারের সময় একটি প্রজাপতিকে ধরতে গিয়ে সমস্ত খাবার-দাবারের দফারফা করায় এবং কাজের ছেলেটিকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে দেওয়ায় মনিরের পিতা নাদুকে স্বদেশি প্রেসে ফেলে দিয়ে আসলেন। এই ঘটনায় পরিবারের সকলেই মনমরা ও বিষণ্ন হয়ে পড়ল। আসলে এ যেন নিজ আত্মীয় বিয়োগের নামান্তর। কেননা, পরদিন বিকালেই মনিরের পিতা নাদুকে মনিরের সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখতে দেখতে মনে করলেন—'কদিন পর মনির যেন তার হারানো ভাইকে বুকে ফিরে পেয়েছে।" বাড়ির পোষ্য বিড়ালের সঙ্গে নিজ পুত্রের এতাদৃশ সাদৃশ্য স্থাপন-সূত্রে পশুর উপর মানবায়ন ঘটেছে। পশু এখানে একটি পরিবারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান, বিরহ-উল্লাসের নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠেছে।

আজীজ আল-আমান তাঁর গল্পে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানটিকে অনবদ্য মুনশিয়ানায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার বিন্যাস কৌশলটি গল্পের ভরকেন্দ্রে থেকেছে। সেই পরিবর্তনের পথ বেয়ে এসেছে নতুন-পুরনোর মধ্যেকার দ্বান্দ্বিকতা।' সেখানে অবশ্যম্ভাবী রূপে লেখক-মানস পুরনোর প্রতি অদ্ভুত মমত্ব অনুভব করেছে। সমকালের গর্ভে সদা জায়মান নতুন-পুরনোর এই দ্বন্দ্ব যদিও পূর্ব-পূর্ব কালের তারাশঙ্করীয় কিংবা সুবোধ-গল্পের ঠিক সমগোত্রীয় নয়। তারাশঙ্করে কিংবা সুবোধ ঘোষে নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্ব যেখানে দুই কালের ও দুই ব্যবস্থার (সামন্তবাদী ও ধনবাদী) সঙ্গে অন্বিত হয়ে চিত্রিত হয় সেখানে আজীজ আল-আমানের স্বতন্ত্র রূপ পায়। এক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতা নতুন-পুরনো দুই প্রজন্মের ব্যক্তিক মানসিকতার মধ্যেই জাগরিত ও বিকশিত হয়ে গল্পরসকে জমিয়ে তোলে। আর প্রায়শ ক্ষেত্রে এ দ্বন্দ্ব মানবিকতাবোধের সঙ্গে শক্তিমত্ত নতুনের অহংকারের মধ্যে ঘটে থাকে।' তাঁর 'আত্মজ' এই ধারার একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প।

এই গল্পে সায়লা বিলের বিখ্যাত হাবড় পেরোনোকে কেন্দ্র করে হারেসের গোরুর গাড়ির সঙ্গে সামাদের গোরুর গাড়ির প্রতিযোগিতা সূত্রে নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়েছে। গাড়োয়ান হিসাবে হারেসের প্রচুর নামডাক। আশেপাশের গ্রামে অন্য অনেক গাড়োয়ান থাকলেও হারেসের গাড়িকে সবাই খাতির করে। কেননা, পথিমধ্যে স্থিত সায়লা বিলের হাবড় একমাত্র তার গাড়িই অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। তাতে একরকম বিজয়গর্ব অনুভব করে হারেস :

"*কতদিনই ত এমন হয়েছে। নতুন গোরু কিনে আর মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেনি। ছুটেছে—আমার হাতির পাশ কাটিয়ে এসেছে। শেষকালে লটাপটা খেয়েছে কাদায়। এখানেই আটকে থেকেছে সারাবেলা। হাট থেকে ফেরার পথে এই হাতি নিয়েই না তুলে দিয়েছি*

কতদিন সে সব গাড়ি।"

এই অনুভব সূত্রে পুরনো কালের প্রতিনিধি হারেসের আধিপত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার সেই গর্ব-আধিপত্য সামাদের বাজারে আনা নতুন গাড়ির কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সামাদের বল প্রদর্শনী-পূর্বক চালানো এবং অনায়াসে সব তুচ্ছ করে সায়লা বিলের হাবড় পেরোনোর মধ্যে পুরনো কালের পরাজয় ও নতুন কালের জয়টি প্রকটিত হয়ে ওঠে:

১। "অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টিকে উপক্ষো করে হারেস আবার উঠে বসল গাড়ির মাথায় এবারেও কয়েক পা গিয়ে আবার কাদায় শুয়ে পড়ল সেই গোরুটা।"

২। "গাড়ির মাথায় বসল সামাদ।... দৃষ্টিতে অনেক আশা, অনেক আনন্দের ঝিলিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠেই গেল গাড়িটা। অত বড়ো ভাঙনটা পার হয়ে গাড়ি ওপরের ডাঙায় উঠেছে।"

নতুনকে জয়ী করানো হলেও, শেষ পর্যন্ত অবশ্য, পুরনোকে পরাজিতও করা হয়নি। পশুর ওপর মানবায়ন ঘটিয়ে, তাকে সন্তানতুল্য জ্ঞান করানোর মধ্য দিয়ে পুরনোর প্রতি অপরিসীম মমত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। আর তাতে করে পুরনোর হৃত-গৌরবকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। তার ঐতিহ্য-গরিমাকে সমানে উড্ডীন রাখা হয়েছে।

তিন

আল-আমানের গল্পজগতের সমাজবাস্তবতার পর্যালোচনায় নিমগ্ন হয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর গল্পের ভুবন মূলত সামাজিক এবং গ্রামীণ সমাজ জীবন গল্পগুলির মূলকেন্দ্রে থেকেছে। তাঁর বেশ কিছু গল্পে উচ্চবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত—এই দুই শ্রেণির মধ্যে স্পষ্ট রেখায় সামাজিক বৈষম্য প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ অসহায়। দরিদ্র। সহায়-সম্বলহীন। তারা সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। থাকতে হয়। উচ্চবিত্তের মহানুভবতায়—উদারতায় কিছু ক্ষেত্রে তাদের অর্থকষ্ট ও অন্নকষ্ট দূর হলেও তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হয়। লাঞ্ছিত হয়। শুধু শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে নয়, কখনো-বা সম্মান লুঠ করে তাকে চরম বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক অভাব-অনটন তাদের মধ্যেকার প্রতিবাদীসত্তাকে কুণ্ঠিত করে রাখে। আল-আমানের 'ওমর শেখ', 'দশ টাকার হালিমা', 'পঞ্চগ্রামের সমাধি' প্রভৃতি গল্প বিশ্লেষণ করলে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ-প্রাপ্তির ইতিহাসটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

'ওমর শেখ' গল্পে গৃহভৃত্য ওমর শেখের প্রতি মনিব ও মনিব-কন্যার বৈষম্যমূলক আচরণ চিত্রিত হয়েছে। গ্রামের পুরনো চাকরকে রাঙাদি হঠাৎ শহরের বুকে পেয়ে গেলে তাকে পুনরায় গৃহভৃত্যের কাজে বহাল রাখে। তারা আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত পরিবেশে থাকলেও ওমরের জন্য বরাদ্দ রেখেছে সিঁড়ির নীচের অন্ধকার ঘরটা। ওমর তাতেই খুশি। বাজার করা, কয়লা আনা, বান্ধবীদের শরবত তৈরির জন্যে পীচ-গলা রাস্তা পেরিয়ে বরফ আনা প্রভৃতি কাজ করলেও ভাগ্যে জোটে শুধু অপমান আর তিরস্কার। টাকার অভিযোগ

এনে তাকে মানসিকভাবে হেনস্তা করা হয়। খাবারে *মনিবের সাথে গৃহভৃত্যের খাদ্যের যথেষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়:*

"একগাল ভাত মুখে। সেগুলো জোর করে ভেতরে ঠেলে দিয়ে উত্তর দিলে : যাচ্ছি। শুকনো ভাত—গিলে গিলে খেতে বেশ কিছু দেরি হয়। থালায় ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে কত কী-ই ভাবে ওমর। কত কী-ই আনে বাজার থেকে—অথচ খাওয়ার সময় কিছু পাওয়া...। কই কুসুমপুরের রাঙাদি ত এমন ছিল না। তবুও ওমর খুশি পুরাতন মনিবদের সে সেবা করার সুযোগ পেয়েছে।

ওপর থেকে আবার ডাক আসে। তীক্ষ্ণ ডাক। কিছু গালিগালাজও, বলে—ভাত গিলতে কত সময় লাগে। গামলা-খানিক নিয়ে বসবে—সে কি দু'চার মিনিটে হয়।"

এই অপমান নির্যাতনের এখানেই শেষ নয়, অনসূয়ার হারিয়ে-যাওয়া নেকলেসকে কেন্দ্র করে তার উপর নেমে আসে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা। তার উপর নেমে আসে হার চুরির অভিযোগ:

"রাঙাদি দরজার গোড়া থেকে লক্ষ করে ওমরের কোমরে কী যেন গোঁজা আছে। বেশ মোটা মতো। আর কি—যায় কোথা। রাঙাদি ঝাঁপিয়ে পড়ে : ওরে হারামজাদা! এই ছিল তোর মনে। গাঁটে করে সাপটে বাড়ি যাওয়ার বায়না!"

দারিদ্র্যপীড়িত ও অন্নলাঞ্ছিত জীবনে উচ্চবিত্ত মানুষের দ্বারা ওমরের মতো হা-অন্নে মানুষকে এমনভাবেই অত্যাচারিত হতে হয়। অপমানিত হতে হয়। নিয়তই।

'দশ টাকার হালিমা' গল্পটি মাসিক দশ টাকার পারিশ্রমিকে হালিমা ও তার শিশুপুত্রের উপর সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের লাঞ্ছনাপ্রাপ্তির কথকথায় মুখর। সকাল থেকেই চৌধুরীবাড়ির একমাত্র মেজ বউ ছাড়া প্রতিটি সদস্যই তাকে নানারকম আদেশ ফরমাশ করে:

১। "এসেই তোকে থালা মাজতে বলল কে? ঘর-দোরগুলো ঝাঁট দিবি ত! আর ঐ সাথে ওজুর পানি দিয়ে যা এক লোটা।"

২। "...চায়ের পানি চড়িয়ে দে শিগগির—উনি এখনই বাইরে যাবেন।"

৩। "মুখ ধোওয়ার মাজন আর পানি দিতে হবে। ছোটো দু'টোর মুখও ধুইয়ে দিতে হবে।"

৪। "কর্তাসাহেব...হাঁক দিলেন: ওরে তামাকটা ধরিয়ে দিয়ে যা।"

শোষণের চিত্র এখানেই শেষ হয় না। হালিমা তার শিশুপুত্র আবুকে চৌধুরীবাড়ির থালা-কুড়ানো ভাতগুলো খেতে দিয়েছে। সেখানে সামান্য একটু ডাল ছাড়া আর কোনো তরকারি জোটে না। অথচ চৌধুরীবাড়ির সদস্যদের জন্য সব বেহেস্তি খাবারের আয়োজন। হালিমার ভাগ্যে যৎ-সামান্য জোটে বলেই তাকে ডিম চুরি করতে হয়:

"বাটির ঢাকনা খুলে ভাত খাওয়াতে বসে হালিমা। তলা থেকে ভাত চাপা দেওয়া

লুকানো ডিমটা বার করে ডিম খেতে বড্ড ভালোবাসে আবু। ডিম দেখে আবু আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ে। পোলাও আর ডিম। ব্যাকুলভাবে আবু বলে: "রাঙা" ভাত আবার আন্তা। ওহ্—আজ মুই ভাত খাব!"

আর এই ডিমটা চুরির জন্য হালিমাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। বড়ো বউ মেজ বউয়ের সামনে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তল্লাশি চালিয়েছে। তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য চৌধুরীবাড়ির সমাজ আর হালিমার সমাজকে আলাদা করে দিয়েছে।

'পঞ্চগ্রামের সমাধি' গল্পের শাহেদকে গ্রামের অর্থগৃধ্নু মোড়লের চক্রান্তে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। বাদলা দিঘির কালো জলে চাষ-করা মাছগুলির উপর নির্ভর করেই শাহেদের সারা বছরের সংসার প্রতিপালিত হয়। কিন্তু গ্রামের মোড়ল নবী শেখের শিকার হতে হয় তাকে। নবী শেখের মেয়ের বিয়েতে মাছের প্রয়োজন। ফলে সে কুট-জটিল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে শাহেদের পুকুরের মাছগুলোকে, ন্যায্য মূল্য না দিয়েই, হস্তগত করে :

১। *"এক অপরিসীম ক্রোধে চিৎকার করে উঠল: খবরদার! কথা বল না আমার সামনে। ফাউ পাওয়া যায়নি মাছ—রক্ত জল করা টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে।"*

২। *"প্রায় মাছের খানা করল নবী শেখ। অপর্যাপ্ত মাছ। বড়ো মাছ—তিন সেরের নীচে নেই একটাও। হাটবার ছিল না—পচে নষ্ট হবার থেকে যা হাতে আসে। খুব সস্তা দামে পেয়ে গেল নবী শেখ।"*

নবী শেখের মতো বিত্তশালী শঙ্খচূড়দের হিংস্র আক্রমণের সামনে পড়ে; তাদের হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শাহেদের মতো দরিদ্র মানুষদের প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হতে হয়।

চার

আল-আমানের গল্পরীতি ও শিল্প নৈপুণ্যের বিচারে প্রবৃত্ত হলে দেখা যায়, তাঁর গল্পের ভাষা কালানুগ ও চরিত্রানুগ স্বভাব-বৈশিষ্ট্য জারিত হয়ে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনসত্য ও সময়-সমাজচিত্র প্রকাশের উপযোগী। তাঁর গল্পভাষার মধ্যে যে প্রবাহমানতা তা চিত্রানুগ। লেখকের বেশিরভাগ গল্পের চরিত্রই সমাজের একেবারে অন্ত্যজ স্তর থেকে উঠে আসায় তাদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভাষা ইতর, দেশি শব্দে, চলিত ক্রিয়ার বিন্যাসে নির্দিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। যেমন :

১। *"...কাল থেকে ওগা সাথে কাজ করলি চার আনা করে পয়সা দেবে বলেছে।"*

২। *"তুলসীচরণ ঘাড় নাড়ল : সব গেলে হয় ককনো। বাঁধ অক্ষে হলে সব অক্ষে। লইলে—"।*

অন্যদিকে নাগরিক জীবন প্রতিবিম্বিত করার সূত্রে তৎসম, ইংরাজি, এমনকি কাবাসুলভ

ধরুপদি শব্দ অনায়াসে তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। কথাবস্তু ও ভাববস্তু অনুযায়ী ভাষার ধাঁচ তাঁর গল্পে প্রায়শই বদলে গিয়েছে।

আল-আমানের গল্পের সূচনা কিছুটা আকস্মিক, তীব্র, দ্রুত পরিণতির দিশারিতে মোড়া। যেমন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহাজনি শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিরোধের প্রেক্ষিতে লেখা 'কোপাই' গল্পটির সূচনা বাক্য—"ওরা নিঃশব্দে পথ এগুচ্ছে।" এই-যে শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিরোধের প্রেক্ষিতে লেখা 'কোপাই' গল্পটির সূচনা বাক্য—'ওরা নিঃশব্দে পথ এগুচ্ছে।' এই-যে সরাসরি গল্পের ভেতরে ঢুকে পড়া, এরকম সূচনার কথা বলেছিলেন এডগার এলান পো—"If his very initial sentence tend not to the outbringing of this effect, then he has failed in his first step." আল-আমানের 'কবর', 'আবির্ভাব', 'উন্মোচন', 'শেখজী ও দ্বিতীয় পক্ষ', 'সালমা শাহেদ শিরিন', 'পলাতক এক মুজাহিদের কথা', 'রাহুমুক্ত' সহ বেশিরভাগ গল্পে এই সূচনারীতি গৃহীত হয়েছে। এই সূচনা সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে—লিখনধর্মী ও কথনধর্মী। তাঁর 'ওমর শেখ', 'কবর', 'উন্মোচন', 'কোপাই', 'পলাতক এক মুজাহিদের কথা', 'ছোটহাজির শিল্পপ্রদর্শনী' গল্পগুলোতে লিখনধর্মী সূচনা চোখে পড়ে। এখানে লেখকের বর্ণনা দিয়েই কাহিনি শুরু হয়েছে। আবার 'চন্দনকাঠের ধোঁয়া', 'একটি আদিম কান্নার ইতিকথা', 'সমান্তরাল', 'শেখজী ও দ্বিতীয় পক্ষ', 'বনমানুষের হাড়' গল্পে কথনধর্মী সূচনার রীতি লক্ষ করা যায়। এখানে লেখক যেন গল্প বলার রীতিটিকে গ্রহণ করেছেন। এছাড়া কোনো কোনো গল্প শুরু হয়েছে নাটকীয়তায় ('সোনালী ইশারা'), কোনো গল্প কবিত্বময় ব্যঞ্জনা দিয়ে ('হাস্নুহানার সৌরভ'), কখনও শুরু হয়েছে চরিত্রের কথোপকথন দিয়ে ('দশ টাকার হালিমা'), আবার কখনও-বা দার্শনিক ভাবনা দিয়ে ('একটি আত্মার ক্রন্দন')- গল্প শুরু হয়েছে।

আল-আমানের ছোটোগল্পের সমাপ্তি-রীতিও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর ছোটোগল্প যেমন শুরু হয়েছে কিছুটা চকিতে, মাঝখান থেকেই সহসা, তেমনি সমাপ্তিতে কোথাও গল্প শেষ হয়েছে—'শেষ হয়েও হইল না শেষে'র ব্যঞ্জনায়, কোথাও অপ্রত্যাশিতের চমকে (Surprising ending), আবার কোথাও-বা শেষ হয়েছে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক চাবুকমারা সমাপ্তিতে—Whipcrack ending রীতিতে। তাঁর 'সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন', 'শেখজী ও দ্বিতীয় পক্ষ', 'সমান্তরাল', 'চন্দনকাঠের ধোঁয়া' গল্পে সরলরৈখিক সমাপ্তিরীতি অনুসৃত হয়েছে। একটু খোঁচা দেওয়ার রীতি—কিছুটা ব্যঙ্গের ঝাঁঝ তাঁর 'শাহানী বেগম ও একটি সরীসৃপ', 'এই শতকের দাহ', 'পঞ্চগ্রামের সমাধি' প্রভৃতি গল্পের সমাপ্তিতে লক্ষ করা যায়। 'মাঠ মাটি হাতেমালী', 'উন্মোচন', 'কোপাই' প্রভৃতি গল্পে তিনি তৃপ্তিময় বৃত্তাকার সমাপ্তিরীতি অনুসরণ করেছেন। আবার 'বনচামেলি', 'সালমা শাহেদ শিরিন', কিংবা 'এনতাজ আলীর মেয়ে' গল্পগুলি নাটকীয় চমক তথা লেখকের উক্তিনির্ভর

সমাপ্তিরীতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

আল-আমানের ছোটোগল্প শিল্প নান্দনিক বিশ্বাসের সার্থক ফসল হয়ে উঠেছে। তিনি 'আর্ট ফর সুইট সেক্'-এর নান্দনিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। অসংযম থেকে সংযম চেতনায় পৌঁছনোর মাধ্যমে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তা তাঁর 'সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন', 'পলাতক এক মুজাহিদের কথা', 'একটি আদিম কান্নার ইতিকথা' প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত হয়েছে। এমন মঙ্গল ও সত্যের সুঅন্বয়ে গ্রথিত নন্দনভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে আবদুল আজীজ আল-আমানের গল্পগুলি অসামান্য শিল্পরূপ লাভ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। আবদুল আজীজ আল-আমান : আল-আমান রচনাবলি ১, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ৭ মাঘ ১৪০২

২। তদেব : সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪০১

৩। তদেব : শেখজী ও দ্বিতীয় পক্ষ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ৬ মাঘ ১৪০১

৫। সোহারাব হোসেন : বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি (তৃতীয় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৪

৬। আবদুল আজীজ আল-আমান : আল-আমানের শ্রেষ্ঠ গল্প, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ৬ পৌষ ১৪০২

৭। তদেব : রৌদ্রময় ভূ-খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৩

৮। আবদুর রাকিব : পথ পসারীর পত্রোত্তর, নতুন গতি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬

৯। ডঃ পরমেশ আচার্য : ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ : সমীক্ষা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০১১

১০। দোস্ত মহম্মদ : আধুনিক ছোটগল্প মনে ও মননে, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, আগস্ট ২০১১

১১। সুশোভন মুখোপাধ্যায় : প্রাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৪১৩

১২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪